বাংলা চর্চা

সম্পাদক
স্বাগতা দাসমোহান্ত

ভারতের মতো বড়ো দেশে বাংলাভাষা কি ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে? পূর্ব দিকের ত্রিপুরা আর অসমের কিছুটা অংশ ছাড়া পশ্চিমবাংলার বাইরে বাংলা কথার প্রচলন প্রায় নেই। অথচ অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই ভাষা, এর সাহিত্য, এর সংস্কৃতি। অন্য ভাষার আগ্রাসনে বাংলাভাষার এই কোনঠাসা হয়ে পড়ার দায় হয়তো অনেকাংশে বাঙালিদের। সেই দায় স্বীকার করে নিয়ে, সীমিত সাধ্যের মধ্যে, দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে চলেছি আমরা। চাকদহ কলেজ তার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে বাঙালি সত্তাকে ফিরে দেখতে চেয়েছে নানা ভাবে : বাঙালির গৌরবের শিকড় সন্ধান করেছে। সে কাজে সহযোগী ছিলেন যাঁরা তাঁদের লেখা নিয়ে এই গ্রন্থ : বাংলা চর্চা।

ড. স্বাগতা দাসমোহান্ত। জন্ম ১৯৬৯। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক। ১৯৯২ এ স্নাতকোত্তর। পি.এইচ.ডি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বাংলা বিভাগে সাতাশ বছরের অধ্যাপনা জীবন। বিগত আট বছর ধরে অধ্যক্ষ, চাকদহ কলেজ, চাকদহ, নদীয়া। মানবাধিকার বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স প্রাপ্ত। উল্লেযোগ্য কিছু গ্রন্থ হলো, বিষয় : রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যবার্তা, ঢোঁড়াই চরিত মানস : অন্ত্যজ জীবনের মহাকাব্য, রামধনু, একলা মেয়ের দিনলিপি ইত্যাদি।

প্রচ্ছদ চিত্র : অন্ধ বাউলের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ, শিল্পী : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
উৎসর্গ ফলক (টেরাকোটা), জোড়বাংলা মন্দির, বিষ্ণুপুর

প্রচ্ছদ : বাবুল দে

এভেনেল প্রেস

ISBN 978-93-94744-49-3

₹৪৫০

সূচিপত্র

১. বাঙালি সত্তার খোঁজ : বিনির্মাণের প্রস্তাবনা — ড. তপোধীর ভট্টাচার্য ❐ ১১

২. সমাজভাষার কয়েকটি প্রেক্ষিত : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর — ড. মিতালি ভট্টাচার্য ❐ ২১

৩. উনিশ শতকে বঙ্গদেশে নারী শিক্ষার বিস্তার ও কয়েকজন পথিকৃৎ — ড. সুমিত্রা চৌধুরী ❐ ৩৩

৪. ওস্তাদ আর মিউজিক ডাক্তার — ড. সর্বানন্দ চৌধুরী ❐ ৪২

৫. অনুবাদের সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির অনুবাদ — অরুন্ধতী ভট্টাচার্য ❐ ৫০

৬. ইংরেজী ও হিন্দির প্রভাবে অধুনা বাংলা ভাষা — ড. নবনীতা বসু হক ❐ ৬৩

৭. বাংলা নাটকের ৫০ বছর : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে — ড. বাবুল বিশ্বাস ❐ ৭৬

৮. বাঙালি সংস্কৃতির পঞ্চাশ বছর : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে — জয়নাব বিনতে হোসেন ❐ ৯০

৯. পরিবেশ ভাবনা : নির্বাচিত বাংলা উপন্যাস — ড. শুভাশিস চট্টোপাধ্যায় ❐ ৯৮

১০. বাংলার বাণিজ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের অবদান ও সাম্প্রতিক ভাবনা : পলাশ বিশ্বাস ❐ ১০৯

১১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকলায় স্বদেশ চেতনা ও আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান — অর্চিতা ভৌমিক ❐ ১২৬

১২. বুদ্ধদেব গুহর কলমে বাঙালি সংস্কৃতি ও ভাষার প্রয়োগগত অভিনবত্ব — প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য ❐ ১৩৬

১৩. সাম্প্রদায়িকতা ও দেশভাগ — দেবাশিষ দত্ত ❐ ১৪৪

১৪. রামমোহন ও বিদ্যাসাগর : বহমান কালগঙ্গার স্রোত — ড. বসুমিতা তরফদার ❐

পরিবেশ ভাবনা ঃ নির্বাচিত বাংলা উপন্যাস

ড. শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়

'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর'

বর্তমান সময়ের প্রক্ষোপটে এই পঙক্তি শুধু রবীন্দ্র-কবিতার একটি উদ্ধৃতি হয়েই নেই, আমাদের অভিজাত শিক্ষিত সমাজের চিন্তা চেতনায় আলোড়ন তুলেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চিন্তা-চেতনা-উপলব্ধি, পরিচিত পরিবেশ সম্পর্কিত ভাবনাকে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। সত্যি বলতে কি উন্নত জীবনযাত্রার স্বার্থে আমরা পরিবেশ নিয়ে ভাবতে বাধ্য হচ্ছি। ১৯৪৬ সালের দুর্ভিক্ষ বাংলার বুকে কৃষকদের জীবন জীবিকার যে সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল, সেই সূত্র ধরেই বাংলা প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। গঙ্গার দুই পারে বিস্তৃত কলকারখানা, সেখানে গড়ে ওঠা শিল্পাঞ্চল সময়ের নিয়মেই শহরতলী ছাড়িয়ে নাগরিক মায়াতেই আপামর মানুষকে শহরমুখী করেছিল। ফলে অর্থনীতির মতোই পরিবেশের ভারসাম্য বদল হয়েছিল। উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের ফলস্বরূপ মানুষ নিজেই নিজের বিপর্যয় ডেকে এনেছে, তা মানুষ হয়তো নিজেই বুঝতে পারেনি। মানুষ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার কোন সচেতন প্রয়াস করেনি। ফলে একের পর এক মারণরোগ যখন মানুষের শরীরে বাসা বেঁধেছে, তখন মানুষ পরিবেশকে ভালো থাকার দাবীকে আজ আর অস্বীকার করতে পারছে না। একের পর এক বৃক্ষচ্ছেদন মাটির বাঁধন আলগা করে দিয়েছে, ফলে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় পরিবেশের বুকে যেন বিধাতার অভিশাপের স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করেছে। বিশ্বউষ্ণায়ন, আবহাওয়ার ঘন ঘন পরিবর্তনে মানুষের মতো গাছগাছালি, পাখিদের জগতও যেন গভীর অনিশ্চয়তায় উৎকণ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অরণ্যদেবতা' প্রবন্ধে বলেছেন, 'মানুষই নিজের লোভ দ্বারা মরণের উপকরণ জুগিয়েছে। বিধাতার অভিপ্রায়কে লঙ্ঘন করেই মানুষের সমাজে আজ এত অভিসম্পাত। লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতিকে ডেকে এনেছে; বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নির্মূল করেছে। বিধাতার যা কিছু কলাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে।' লেখকেরা সাধারণের তুলনায় অনেক বেশি প্রতিক্রিয়াশীল বলেই তাঁদের রচনায় সাধারণের এই যন্ত্রণার চিত্র প্রেক্ষাপট রূপে উঠে এসেছে। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের এই প্রয়াস নতুন এক সাহিত্য

প্রবণতার জন্ম দিয়েছে। কেননা 'নতুন সঞ্জীবনী চেতনার পথ ও পাথেয় স্থানু নয়, কারণ পরাক্রান্ত ও লোলুপ শক্তির দাম্ভিকতা মানুষের জগতকে নিষ্পেষিত করার জন্যে নিত্যনতুন প্রকরণ আবিষ্কার করেছে। অস্থির এই জগত থেকে শিল্পিত পাঠকৃতি নির্মাণের গুরুদায়িত্ব ক্রমশ গুরুতর হয়ে উঠেছে;'[২]

প্রাচীন বাংলার আদিতম নিদর্শন চর্যাপদে নদী বিধৌত জলপথের সাথেই পদকর্তা শবর শবরীর জীবনচর্চার বর্ণনায় শবরীর ময়ূরপুচ্ছের, গুঞ্জফুলের মালার উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি কার্পাস ফুলের ফোটা, কঙ্গুটিনা ফসলের উল্লেখ, হরিণের উপস্থিতি তপোবনের অরণ্য আশ্রিত পরিবেশে শান্ত জীবনচর্চার ইঙ্গিত দেয়। যদিও হরিণ শিকার সেকালেও পরিবেশের বিরুদ্ধবাদীদের উপস্থিতির ইঙ্গিত করে। বাংলায় প্রথম রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক রচনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের বিভিন্ন পর্যায়ের বর্ণনাতে বৈষ্ণব পদকর্তারা প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিপুলভাবে রাধাকৃষ্ণের মিলন বিরহের বিভিন্ন পর্যায়ে সচেতন ভাবে ব্যবহার করেছেন। রাধা ও কৃষ্ণের রাগানুরাগ যেন প্রকৃতিলোকেই কালজয়ী হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণব পদাবলীর অভিসার পর্যায়ের পদ অনিশ্চিত জীবনের রূপক দোদুল্যমান পরিবেশের আশ্চর্য সৃজন সম্পদ। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের সুবর্ণ সংগ্রহ রামায়ণ ও মহাভারতে প্রকৃতির অনুপম শোভা বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণ রামের বনবাস জীবন, সীতার লব কুশকে নিয়ে মহর্ষির কন্বের আশ্রমে অবস্থান প্রভৃতিকে নিয়ে কৃত্তিবাসের পরিবেশে ভাবনা 'অরণ্য' নামে কান্ডের নামকরণে অনন্যতা পেয়েছে। সীতাহরণ যেন প্রকৃতির বুকে ঘটে যাওয়া এক বিপর্যয়। কৃত্তিবাসের বর্ণনায় প্রকৃতিলোক ও মানবসত্তা যেন অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। মহাভারতেও পাণ্ডবদের একাধিকবার অরণ্যবাসের বর্ণনায় বাংলা প্রকৃতি যেন রূপ পেয়েছে। ভাগবতের অনুবাদে বৃন্দাবন অংশে গিরি গোবর্ধন অংশ বর্ণনা, গোচারণ অংশের উল্লেখ সেকালের প্রকৃতি নির্ভর জীবনচর্চার ইঙ্গিত দেয়। বাংলার প্রাণের মঙ্গলকাব্যগুলিতেও শান্ত মায়াচ্ছন্ন প্রকৃতির উল্লেখ আছে। দেবী মনসা সর্পের দেবী হলেও তিনি উর্বরা শক্তির প্রতীক। চাঁদ সদাগরের জীবিকার একটা বড় উৎস ছিল ভেষজ ঔষুধে সমৃদ্ধ নাখরা বন, যেটা জোর করে ধ্বংস করা হয়েছিল। স্বামীর মৃতদেহ কলার মান্দাসে ভাসিয়ে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার সময় বেহুলা যে সমস্ত মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, তাঁদের বেশিরভাগই শ্রমজীবী মানুষ। চণ্ডীমঙ্গলেও ফুল্লরার বারোমাসীর বর্ণনা ব্যাধ সমাজের প্রকৃতি নির্ভরতার আদর্শ দৃষ্টান্ত। কালকেতু ব্যাধ, শিকার তাঁর জীবনধারণের উপায়, যার ফলশ্রুতিতে পশুরা বিপন্ন, বিপন্ন পশুদের রক্ষা করতে দেবীর আশীর্বাদে কালকেতু বন কেটে গুজরাট নগর নির্মাণ করে সেখানে রাজা হয়ে বসেছে। জীবন ও জীবিকার পরিবর্তনের পাশাপাশি অসহায়

প্রাণীকূল রক্ষা পাওয়ায় প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। শিবায়নে কৃষক শিবকে পুনরায় স্বর্গে নিয়ে যেতে পার্বতী মর্তে নেমে এসেছেন। বাংলার মা বোনেদের পালনীয় ব্রত — উপাসনার মধ্যে প্রকৃতির বিভিন্ন উপকরণের আশ্চর্য সহাবস্থান দেখি। এইসব ব্রতের পূজা সামগ্রীর মধ্যে বাংলা প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার দেখি। এই ব্রত পালনের মধ্যে লুকিয়ে আছে মৃত্তিকা উর্বরতার প্রেক্ষিতে ধরণীর সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা হয়ে ওঠার প্রসঙ্গটিও। প্রথা পালনের সঙ্গে যে ছড়া জড়িয়ে আছে, তার মধ্যেও জড়িয়ে আছে প্রকৃতি সংরক্ষণের প্রসঙ্গটিও।

বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় সচেতন পরিবেশ ভাবনার প্রকাশ হিসেবে বিভূতিভূষণের আরণ্যক উপন্যাসের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের একাধিক গল্প উপন্যাসে পরিবেশকে সার্থক প্রেক্ষাপট রূপে ব্যবহারের নিদর্শন দেখি। শরৎচন্দ্র যখন তার শ্রীকান্ত উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীকান্তের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের মাছ চুরির অভিযানের প্রকৃতি বর্ণনায় বলেন, 'নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ, নিঃশঙ্ক, নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি', তখন বর্ণনীয় ভাষা ও কল্পনায় আমরা পাঠকেরা মুগ্ধ হই। কিন্তু আধুনিক লেখকের ভাবনায় পরিবেশ পৃথক এক সংরূপের ইঙ্গিত দেয়, পাশ্চাত্য সমালোচকেরা যার নামকরণ করেছেন 'ইকোক্রিটিসিজম'।[২] ইকোক্রিটিসিজম ভাবনাটির প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় পরিবেশবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে র‍্যাচেল কার্সনের *sailent spring (1962)* গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর। যদিও ইকোক্রিটিসিজম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন উইলিয়াম রাকার্ত ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে *'Literature and Ecology :An experiment in ecocriticism'* প্রবন্ধে। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল এই শব্দ এবং ভাবনা যেন সাহিত্যচর্চায় ব্যবহৃত হয়। মূলত ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরিবেশবাদী ভাবনার সমৃদ্ধি ও বিকাশ, যেখানে রাকার্ত-এর গ্রন্থটির প্রভাব আছে। পরিবেশ ভাবনার বিকাশের পর্বকে মূলত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়।[৩] ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের সময় থেকেই প্রথম প্রবণতার সূত্রপাত, যেখানে প্রকৃতি নিয়ে ভাবনা ও অর্থপূর্ণ চর্চাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এই সময়ে পার্থক্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হওয়া দ্বিতীয় প্রবণতা প্রকৃতপক্ষে প্রথম প্রবণতারই সম্প্রসারণ। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে *Association for the studyof Literature and Environment* নামক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয় *ILSE-Interdisciplinary studies in Literature and Environment* নামে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা পরিবেশ বলতে বুঝিয়েছেন, ' যে সব সজীব বা বিজ্ঞানের পরিভাষায় biotic কিম্বা নির্জীব বা

জড় বা বিজ্ঞানের পরিভাষায় abiotic উপাদান, মানুষের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, এবং যেগুলি মানুষের বেঁচে থাকাকে সবসময়ই প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করছে — তাদেরই সার্বিক সমবায়।'[৪] পরিবেশবাদীরা এই পর্যায়ে প্রকৃতির সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যে, মানুষের মানবিক ও অমানবিক সত্ত্বার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছেন। এই পর্যায়ে পরিবেশবাদীরা অন্ত্যজ ও অবহেলিত মানুষ, যারা পরিবেশ দূষণের নির্মমতায় ক্ষতিগ্রস্ত তাদের পাশে দাঁড়াতে সচেষ্ট হয়েছেন। সাহিত্যে পরিবেশবাদী ভাবনার প্রকাশের বেশ কয়েকটি রূপ আছে, যথা *Pastoral, wilderness, ecofeminism. Pastoral* শব্দটিআমেরিকান সাহিত্যে মূলত শহর ও গ্রাম জীবনের মধ্যে তুলনা সৃজনে ব্যবহৃত হয়। wilderness পর্যায়েপরিবেশবিদরা মূলত কিভাবে সুজলা সুফলা ভূমি জনহীন শূন্যপ্রান্তরে পরিণত হয়, তার স্বরূপ সন্ধান করে। অন্যদিকে ecofeminism পর্যায়ে প্রকৃতি ও নারীর উপর পুরুষ কিভাবে আধিপত্য বিস্তার করে, তার স্বরূপ তুলে ধরা হয়। আসলে এক কথায় ইকোক্রিটিসিজম হল সেই সাহিত্য তথা পরিবেশের চর্চা যেখানে গবেষকরা সাহিত্য বিচার করে দেখেন সেখানে পরিবেশ সচেতনতার ভাবনা কতটা প্রকাশ পেয়েছে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিবেশকে উপাদান অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ভৌত পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। আমাদের চারিপাশে যে সকল প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে, সেগুলিই প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান। এই প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্মদাতা ঈশ্বর স্বয়ং। সবুজ অরণ্যে ঘেরা বাংলাদেশের মোহময়ী রূপ এই পরিবেশের আশ্চর্য সৃষ্টি। অন্যদিকে মানুষ যে পরিবেশের জন্মদাতা, সেই পরিবেশ হল সামাজিক বা কৃত্রিম পরিবেশ। এই পরিবেশ নির্মাণে প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তার থেকে মানুষের চাহিদা অনেকবেশি গুরুত্ব পেয়েছে। সঙ্গত কারণেই এই পরিবেশই পরিবেশবাদী সাহিত্যিকের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে, তাঁদের রচনায় এই পরিবেশের নৈরাশ্যবাদী ভাবনা রূপ পেয়েছে।

মানুষের নির্মাণে প্রকৃতির শান্ত রূপের কিভাবে বদল ঘটে তার উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে আমাদের বহু পঠিত রাজশেখর বসুর লেখায় কল্পবৈজ্ঞানিক 'গা-মানুষ জাতির কথা' গল্পটিকে। গল্পটির কাহিনি অংশ পাঠে জানতে পারি উন্নত দেশগুলির যারা শাসনকর্তা তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য চরমে উঠলে তারা তাঁদের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করতে পরস্পরের প্রতি অ্যানাইহিলিয়ম বোমা নিক্ষেপ করলেন। এই বোমার যে প্রতিক্রিয়া তার বর্ণনাতেই ফুটে উঠেছে, পরিবেশের ভারসাম্যতা কিভাবে নষ্ট হয়েছে। লেখকের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে, লন্ডন, প্যারিস, পিকিং প্রভৃতি বড় বড় শহরে রাস্তার নীচে সে গভীর ড্রেন ছিল তাতে লক্ষ লক্ষ ইঁদুর বসবাস করতো। তাদের

বেশিরভাগই বোমার তেজে প্রাণ হারালো, কিন্তু কিছু ইঁদুর বেঁচে গেল দৈবক্রমে।

'বোমা থেকে নির্গত গামা রশ্মির প্রভাবে তাদের জাতিগত লক্ষণের আশ্চর্য পরিবর্তন হল, জীব বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন মিউটেশন। কয়েক পুরুষের মধ্যেই তাদের লোম আর ল্যাজ খসে গেল, সামনের দুই পা হাতের মতন হল, পিছনের পা এতো মজবুত হল যে তারা খাড়া হয়ে দাঁড়াতে আর চলতে শিখল। মস্তিষ্ক মস্ত হল, কণ্ঠে তীক্ষ্ণ কিচকিচ ধ্বনির পরিবর্তে সুস্পষ্ট ভাষা ফুটে উঠল, এক অবস্থায় তারা মানুষের সমস্ত লক্ষণ পেল।'[৫]

কল্পবৈজ্ঞানিক এই গল্প সমালোচক মহলে পরিবেশবাদী ভাবনার জন্ম দেয়নি। কারণ বিচ্ছিন্ন এই গল্প সমসাময়িক পরিবেশকে নিয়ে মানুষের ভাবনাকে তুলে ধরেনি। যেখানে মানুষ পীড়িত, সেখানেই সাহিত্যিকের আকর্ষণ। কারণ মানুষের জীবনই সাহিত্যিকের প্রধান অন্বেষণ। 'উপন্যাসের অন্বিষ্ট সমাজ নয়, সময় নয়, ইতিহাস নয়, উপন্যাসের অন্বিষ্ট ব্যক্তিমানুষ ..... যেখানে সমাজ, সময় আর ইতিহাসই প্রধান, অন্বিষ্ট মানুষ অপ্রধান-সেখানে উপন্যাস সময়ের পাঁকে আটকে যায়'।[৬] সেই সময়ের বিশ্লেষণে তার কদর্য রূপ লেখকের বর্ণনায় ফুটে উঠে। কপালকুন্ডলায় 'পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছো?' অংশে পরিবেশের অনিশ্চয়তা যতখানি প্রধান হয়ে উঠেছে, ততটা চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি। একরাত্রি গল্পে শেষাংশের ছোট বড়ো দশটি পরিচ্ছেদে প্রকৃতি ও গল্পকারের প্রেম ভাবনার যুগপৎ সম্মিলন চরম পরিণতি পেয়েছে পরিবেশ সৃজিত অন্তরকথনভাষ্যে 'আমার পরমায়ুর সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরমন সার্থকতা।' ব্যক্তির না বলা কথা পরিবেশের বর্ণনায় পূর্ণতা পেয়েছে। এখানে ব্যক্তি নয়, পরিবেশই প্রধান। একই কথা বলা যেতে পারে রবিঠাকুরের নিশীথে প্রভৃতি ভৌতিক গল্পের ক্ষেত্রেও। কিন্তু 'সমকালকে ধরতে না পারলে উপন্যাস বাঁচে না'[৭], তাই বিভূতিভূষণের আত্মকথনে ফুটে ওঠে যুগযন্ত্রণার ছবি। মানুষের অভিজ্ঞতা ও ধারণার নিয়ন্ত্রণ ও নির্মাণ করে ভাষা। পরিস্থিতি অনুসারে বাক্যের অর্থ নির্ধারিত হয়। অধ্যাপক পবিত্র সরকারের মতে 'ভাষার অর্থের মধ্যে একটা নিত্য সাপেক্ষতা আছে, তা সব সময় অন্য শব্দ, প্রসঙ্গ পরিবেশ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। এই পরিবেশের একটা হল *dialogism* অর্থাৎ কোন কথার উত্তরে একথাটা বলছি এর কথার উত্তরে আবার কোন কথা উঠবে— এই চলমান উপলক্ষ্য'[৮]। আধুনিক উপন্যাস এই অপ্রস্তুতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখে রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে। তাই মধ্যযুগের সাহিত্যে কালকেতুর বন কেটে রাজা হওয়ার উদ্দেশ্য বসতি স্থাপন আর মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকারে বীরসার লড়াই পাঠকের কাছে স্বতন্ত্র তাৎপর্য

নিয়ে ধরা দেয়। কপালকুন্ডলাকে 'পালকি বাহকেরা অরণ্য মধ্যে রেখে চলিয়া গেল' পরিবেশের প্রেক্ষিতেই এক অনিশ্চয় জগতের ইঙ্গিত দেয়। একই কথা বলা যায় রবীন্দ্রনাথের নিশীথে গল্পের ফণীভূষণের সম্পর্কে, যিনি তার অপরাধবোধের আতঙ্কেই 'ওকে, ওকে, ওকেগো' শব্দে উৎকণ্ঠিত হয়ে এক অশরীরী আত্মার উপস্থিতির কল্পনা করে আধ-ভৌতিক পরিবেশের জল্পনা দেন।

পরিবেশবিদদের মতামতের সূত্রে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার কয়েকটি মাত্রা চিহ্নিত করতে পারি — প্রথমত, নগরায়ন জনিত, দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন জনিত। প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনেও থাকে মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থিতি। উন্নতজীবন ধারণের স্বপ্ন কিছু মানুষের জীবনে যে বিপর্যয় নিয়ে আসে আধুনিক উপন্যাসিকের প্রতিক্রিয়ামূলত তাকে ঘিরেই। গাছ কেটে বসতি স্থাপনের সঙ্গেই যে একদিকে জল, বায়ু, পরিবেশের স্বাভাবিক বিন্যাস নষ্ট হচ্ছে, শুধু তাই নয় প্রকৃতি নির্ভর কিছু মানুষের বেঁচে থাকার সামান্য প্রেক্ষাপটটুকুও হারিয়ে যাচ্ছে, সেই চরম সত্য আধুনিক লেখকদেরও ভাবিয়েছে। বিভূতিভূষণ নিঃসন্দেহে এই পরিবর্তনের সময়ের প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতিপ্রেমী কথাসাহিত্যিকের অগ্রদূত। তার পরেই আমরা বেশ কিছু উপন্যাসে এই ভাবনার অনুসৃজন দেখি। ১৯৮২ থেকে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে রচিত বাংলা উপন্যাসের মধ্যে বুদ্ধদেব গুহের লেখা শালডুংরি (১৯৮৭), জঙ্গলের জার্নাল (১৯৭৭), পারিধী (১৯৮৩), লবঙ্গীর জঙ্গলে (১৯৭৭), অভিলাষ (১৯৯১) উপন্যাসে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে প্রকৃতিকে ধ্বংস করার যে প্রচেষ্টা চলছে, তার ইঙ্গিত পাই। চিত্তরঞ্জন মাইতির মন অরণ্য (১৯৮৮) গ্রন্থের দ্বিতীয় উপন্যাস প্রেমপিপাসী প্রকৃতি ধ্বংসের প্রয়াস ও পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে শিল্পীত প্রতিবাদ। তবে কিন্নর রায়ের প্রকৃতিপাঠ এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের জলতিমির, বিন্দু থেকে বৃত্তে, শেষ রাতের শেয়াল, রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের চারণে প্রান্তরে, ভাঙা নীড়ের ডানা, কথার কথা প্রভৃতির উপন্যাসের কথাও এই প্রসঙ্গে বলা যায়।

প্রকৃতিভাবনার সচেতন রূপ নির্মাণ প্রথম পাই বিভূতিভূষণের কাছে। পথের পাঁচালীর অপু-দুর্গা শুধু সাধারণ চরিত্র মাত্র নয়, লেখকের আজন্ম লালিত প্রকৃতির মায়াময় সরলতায় ঘেরা মনের শৈশব আশ্রিত রূপায়ণ। অপু দুর্গার অবস্থানের প্রেক্ষাপটটি দেখলেও বিভূতিভূষণের মনের জগতটি অনুমান করা যায়। 'আরণ্যকে'র প্রধান চরিত্র সত্যচরণ, যিনি প্রকৃতপক্ষে লেখকেরই সত্তা, তিনি জঙ্গল মহলের কাজ নিয়ে পৌঁছেছিলেন ভাগলপুরে। যে অরণ্য প্রকৃতির জন্য বিভূতিভূষণের মনের গোপনে আগ্রহ জেগেছিল কর্মের জগতে পৌঁছে তা পূর্ণতা পেল। তারই অভিজ্ঞতার প্রকাশ

আরণ্যক। যখন প্রথম জঙ্গলে কাজের সূত্রে পৌঁছলেন, তখন জঙ্গল আদৌ তার কাছে আলাদা কোন মায়ার বা ভালবাসার জগত তৈরি করতে পারেনি। গ্রান্ট সাহেবের বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে তার মনে পড়েছে কলকাতার জীবন 'কলুটোলার মেস, কপালীটোলার সেই ব্রিজের আড্ডাটি, গোলদিঘিতে আমার প্রিয় বেঞ্চ খানা, —প্রতিদিন এমন সময়ে যাহাতে বসিয়া কলেজ স্ট্রীটের বিরামহীন জনস্রোত ও বাস মোটরের ভিড় দেখিতাম। হঠাৎ যেন কতদূরে রহিয়াছে মনে হইল তাহার। মন হু হু করিয়া উঠিল — কোথায় আছি! কোথাকার জনহীন অরণ্যে-প্রান্তরে খড়ের চালায় বাস করিতেছি চাকুরির খাতিরে। মানুষ এখানে থাকে?' অথচ সেখানেই তিনি পেয়েছিলেন মহালিখারূপ পাহাড়, ধনঝুরি পাহাড়, অখিল কুচা, বহরাবুজ, জয়ন্তী ও আমলাতলীর পাহাড়। এখানে ফুলকিয়া বইহারের জঙ্গল, বোমাই বরু, নাড়া বইহারের জঙ্গল আছে। পাহাড়িয়া মিছি নদী, কুশী, আছে ঝর-ঝর ঝরে যাওয়া কারো চানন ও কলবলিয়া। আছে শাল, শিশু পিয়াল-অর্জুন, হরিতকি, আমলকি ইত্যাদি। এই প্রকৃতির বুকেই জীবিকার সূত্রে তাঁকে ত্রিশ বিঘা জমি বন্দোবস্ত করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে শহর থেকে গ্রামে আসতে হয়েছিল। 'অরণ্যকে বিনষ্ট করার নির্মম অথচ অত্যাবশ্যকীয় কাজে লিপ্ত হয়েছে উপন্যাসের প্রবক্তা। আধুনিক সভ্যতার এই ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ নেই'[৯]। দিগন্তহীন মহালিখারূপের পাহাড় ও মোহনপুরা অরণ্যনানীর পটভূমিতে বইহারের ও লবটুলিইয়ার অরণ্য প্রান্তর বিনষ্ট করে বসতিস্থানের কাজটি সত্যর হাতেই নিষ্পন্ন হয়েছিল। পেশাগত জীবনে এই কাজের জন্য আত্মগ্লানির শেষ নেই। পেশাগত কাজের ফলেই তার হাতে ধ্বংস হবে প্রকৃতি। ইজারাদারেরা জমি সাফ করে ফসল রোপন করবে। ঘরবাড়ি নির্মাণ করে বসতি স্থাপন করবে। নির্জন অরণ্য প্রান্তর ব্যস্ত জনপদে পরিণত হবে। মাহাতোর দল নতুন তোলা গড়ে তুলবে। অরণ্যকে ধ্বংস করে মানুষের বসতিস্থাপন হবে। 'গরিব মানুষ আসে কিছু জমির আশায়, চাষবাস করে খাবে, আর বড়ো মহাজন বিঘার পর বিঘা জমি নিয়ে জমিদারী ফাঁদে। বনভূমি নষ্ট করে থাকে .... অদিবাসী অন্ত্যজ মানুষের যে অধিকার এতোদিন কাড়তো স্থানীয় মহাজন, জমিদার, সামন্তপ্রভু, তা কাড়তে এসেছে বহুজাতিক কোম্পানীগুলি। তার দোসর হয়েছে রাষ্ট্র আরগ্রামের ফড়ে মহাজন যারা থাকে রাজনৈতিক আশ্রয়ে। তাদের পবিত্র সেই ধনঝুরি পাহাড়ই তো লিজে নিয়ে ভাঙতে শুরু করেছে মহাজন আর বহুজাতিক কোম্পানীগুলি'।[১০] আরণ্যক উপন্যাস প্রকৃতির রূপমুগ্ধতার সঙ্গে এই সভ্যতার এই পরিবর্তনেরও আখ্যান।

কিন্নর রায়ের 'প্রকৃতিপাঠ' (১৯৯৩) আধুনিক লেখকের প্রকৃতি ও পরিবেশ সচেতনতার উজ্জ্বল নিদর্শন। কলকাতা ও শহরতলীর চারপাশের সবুজকে ধ্বংস করার বিরুদ্ধে সতীপ্রসন্ন নামের এক প্রকৃতিপ্রেমী দৃঢ়চেতা সংকল্পবদ্ধ মানুষের লড়াই রূপ

পেয়েছে, এই উপন্যাসে। সত্যচরণের মতোই সতীপ্রসন্ন নস্টালজিয়ার সবুজ কলকাতার স্বপ্ন দেখেন' এখন যেখানে চারুর মাঠ সেখানে পুকুর। বাড়ির ভেতর বেজি, সাপ! শেয়াল ডাকত রাতে। ভাম আসত রান্নাঘরে;[১১] টালিগঞ্জ ব্রিজ মহাবীরতলা সিরিট শ্মশান পেরিয়ে চব্বিশ পরগনার এক বিস্তৃত অঞ্চলে আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নির্বিচারে সবুজ ধ্বংস করে গড়ে তোলা হয়েছে একের পর এক আবাসন। এই অশুভ কাজে জড়িত রাজনৈতিক নেতা থেকে প্রোমোটার সকলে, তার বিরুদ্ধেই লেখকের প্রতিবাদ। 'বহুতল বাড়ি নামিয়ে দিচ্ছে জলের স্তর। বেআইনি কনস্ট্রাকশন ভেঙে পড়ে মানুষ মারা যাচ্ছে। শাল গাছ কেটে অরণ্য ধ্বংস করে, মানুষ তার সুবিধার জন্য লাগাচ্ছে ইউক্যালিপটাস, যা জলের স্তর নামিয়ে দিচ্ছে সমস্ত বনভূমির। .... শীত এলে ধোঁয়া মেশা কুয়াশার ভারি পর্দা ঝুলে থাকে কলকাতার আকাশে। শ্বাস নিতে কষ্ট! হাজার হাজার উনুনের ধোঁয়ায়, রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক মাইকের চিৎকারে হাওয়া পচে"[১২]। আদ্যন্ত পরিবেশ সচেতন এই সত্যপ্রসন্নর স্বপ্ন ও প্রতিবাদের ভাষা অনেকটাই তার প্রকাশিত পরিবেশ নামক পত্রিকাকে ঘিরে আবর্তিত। 'তাকে ঘিরে নানা ভাবনা সতীপ্রসন্নের জীবনে অক্সিজেন' এই পত্রিকা আবার এক আন্তঃবিপনন ও প্রকাশ জনিত সমস্যার সম্মুখীন। এর মূলেও আছে সত্যচরণের পরিবেশ ভাবনা। 'সম্প্রতি বিজ্ঞান ভাবনা আর ফ্যান্টাসি গল্পের কাগজ ভবিষ্যৎ প্রকাশিত হয়েছে। শেয়ালদার কাছে বিশাল মাল্টিস্টোরিড অফিস"[১৩]। এই পত্রিকা প্রকাশের পর থেকে সতীপ্রসন্নের মনে দুশ্চিন্তা বেড়েছে। তার পরিবেশের অন্যতম লেখক তথা সহকর্মী অরিনকে বেশি অর্থের লোভ দেখিয়ে নিয়ে নিতে চায় ভবিষ্যৎ পত্রিকা। বেশি অর্থে তার লেখা ছাপা হয় ভবিষ্যৎ পত্রিকায়। কলেজ স্ট্রিটের এক কোনে পত্রিকা শুধু নয়, পত্রিকা অফিস বাঁচানোর জন্য তাঁর লড়াই চলে কয়েমি শক্তির সাথে। মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে সতীপ্রসন্নের আত্মসম্মানকে টলিয়ে দেওয়া যায়। কলকাতার পাখীরালয়, সালিম আলি, কলকাতার পাখি, চিড়িয়াখানার পক্ষী সংসার, ভবিষ্যতে প্রকাশিত অরনীর লেখাগুলি মন দিয়ে পড়েন সতীপ্রসন্ন। মনে মনে একই সঙ্গে তৃপ্তি ও নিরাশা তাঁকে দ্বিধান্বিত করে। তৃপ্তি এখানেই যে পরিবেশের বিবিধ সমস্যা অরনির কারণেই হোক না কেন, সাধারণ মানুষকে ভাবাচ্ছে, নিরাশা এখানেই যে কায়েমী সুযোগসন্ধানী প্রকৃতি স্বার্থান্বেষী শক্তির কাছে তিনি হেরে যাচ্ছেন।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'জলতিমির' এই প্রবণতার উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'তিমির' শব্দটির অর্থ অন্ধকার। জলের অন্ধকার বলতে জলদূষণকে বোঝানো হয়েছে, যার মূল ভাবনা রূপ পেয়েছে আর্সেনিক দূষণকে কেন্দ্রে রেখে। জলের মধ্যে আর্সেনিক সকলের অগোচরে মানুষের অকালপতনের কারণ হয়েছে, উপন্যাসিক এই ভাবনাকে রূপ দিতে

গিয়ে কালীয়নাগের দংশনের পৌরানিক কাহিনিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। 'সাধন চট্টপাধ্যায়ের জলতিমির উপন্যাসটি মানুষ নির্ভর হলেও নিসর্গ এবং পরিবেশ কিন্তু উপন্যাসটির মৌল নায়ক। যন্ত্রণাকাতর বেচারা, ভাবপ্রকাশহীন উত্তর ও দক্ষিণ পরগনার প্রকৃতি গর্ভে বিষক্রিয়ার উপাখ্যানই জলতিমির'।[১৪] এই উপন্যাসের কাহিনিতে পশ্চিমবঙ্গের আর্সেনিক দূষণের সমস্যাকে প্রধান করে দেখা হয়েছে। চলমান জীবন ও সমাজকে পরিবেশ বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে রেখে বিচার করেছেন লেখক। বাংলাদেশের কোন এক অখ্যাত মালঞ্চ গ্রামের অন্নপূর্ণার জীবন সংগ্রামের লড়াই এই উপন্যাসের প্রাণ। এই গ্রামের আজন্ম অশিক্ষিত বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষজন, যাদের কাছে জীবন ও মৃত্যুর ভেদ এতো তীব্র নয়, তাদের শরীরে তাদের উপলব্ধির দুর্বলতাকে হাতিয়ার করেই আর্সেনিক প্রবেশ করেছে, যার পরিণতিতে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। অন্নপূর্ণাই একমাত্র চেতনা শক্তি, যে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। আর্সেনিকের উৎস কোথায়? লেখক তাও সুন্দর বচনে তুলে ধরেছেন। ভূ বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন ভূতল থেকে ৭০ থেকে ২০০ ফুট গভীরে ৪৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ভূস্তর, যা আর্সেনিক পুষ্ট তা অবস্থান করছে। 'ভূবিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিক গবেষণায় জানতে পেরেছেন গ্রীষ্মের শুখা দিনে সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের বিপুল পরিমান ব্যবহারই ঐ স্তরটির মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেছেন এলোপাথারি ডিপ এবং স্যালো নলকূপ দিয়ে জল টেনে তুলবার ফলে ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত — যখন বৃষ্টি হয় না— জলস্তর অত্যন্ত নিচে নেমে যাওয়ায় পাইরাইট নামে এক ধরনের মিনারেল, আর্সেনিক মিলেমিশে লুকিয়ে থাকে যার মধ্যে, জলতলের শূন্যস্তরে বায়ুর সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিষে পরিণত হয় এবং ছড়িয়ে গিয়ে সমস্ত স্তর আক্রান্ত করে।' আর্সেনিক থেকে আমরা দুইভাবে মুক্ত হতে পারি, প্রথমটি আর্সেনিক মুক্ত জল পেতে হবে। তার জন্য গ্রামের যত টিউবওয়েল আছে, তুলে ফলে অন্তত ৪০ পাইপের বসাতে হবে। এছাড়া নদীর জল তুলে সেইজলকেও শুদ্ধ করে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও এই রোগ থেকে মুক্ত হতে গেলে নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। কিন্তু এই সবের উপরেও থাকে প্রতিবাদের চেতনা ও মানুষকে অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত করার শক্তি। এই শক্তির কথাই লেখক বলতে চেয়েছেন অন্নপূর্ণার মধ্যে দিয়ে। অন্নপূর্ণা নিজের বোধে আর্সেনিকের বিপদের কথা বুঝেছিল, কিন্তু নিজের স্বামী ও গ্রামের লোকের ঈশ্বর বিশ্বাসের ভাবনার প্রতি কোন অবিশ্বাস করেনি। নিজে সাধারণ গ্রামবাসীদের সঙ্গে একজোট হয়ে বনবিবির থানে মানত করতে গিয়েছে, কিন্তু যখন অন্নপূর্ণা নিজের শরীরে আর্সেনিকের উপস্থিতি উপলব্ধি করেছে তখন গ্রামবাসীদের বিশ্বাসের বিপরীতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে ছাড়েনি যে বনবিবির অস্তিত্ব মিথ্যা। এমনকি

এখানেই না থেমে স্বামী পরাণকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে যে তার মৃত্যু হলে তিনি যেন বনবিবিকে উপড়িয়ে ফেলেন। কিন্তু পরাণ পারেনি, পরাণেরা পারে না, লোকচক্ষুর বিশ্বাসকে অবজ্ঞা করতে। এর পাশেই থাকে রত্না, সে বিজ্ঞানমঞ্চের প্রেক্ষাপটে যা উপলব্ধি করে সেটাই প্রকৃতপক্ষে লেখকের উপলব্ধি, আপাতদৃষ্টিতে যাকে আর্সেনিক বলে মনে হয়, তার শিকড় অনেক গভীরে। আসলে আর্সেনিক রূপ বিষের আছে তিনটি রূপ, প্রথমটি দারিদ্র্যের, অন্যটি অপুষ্টি, অপরটি অশিক্ষার। এছাড়া আছে রাজনীতির অঙ্ক, যেখানে ভালো মন্দের সংজ্ঞা পার হয়ে তুচ্ছ রাজনৈতিক সুবিধাবাদ মানুষকে গ্রাস করেছে। জলতিমির উপন্যাসে লেখক মানুষের জীবনে ও পানীয়ে তিমির বিনাশের স্বপ্ন দেখিয়েছেন নিজের দৃষ্টিকোণ দিয়ে।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে নানা প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। লেখকের ভাবনার সঙ্গে পাঠকের চাহিদা মিশেছিল, প্রেক্ষাপট হিসেবে ছিল সময় এবং তা নিয়ে লেখকের প্রতিক্রিয়া। রাজনীতির বিভিন্ন আলোড়ন, সমাজের বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছিল মানবীবিদ্যাচর্চা, কল্পবৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, রহস্যগল্প, পৌরাণিক গল্পের মতো বিভূতিভূষণ ও তার পরবর্তী লেখকদের রচনায় প্রকৃতিকে নিয়ে রোমান্টিসিজমের পাশাপাশি ছিল নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংসের বিরুদ্ধে লেখকের উদ্বেগ। বিভূতিভূণের পর কিন্নর রায়, অমিয়ভূষণ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়, তিলোত্তমা মজুমদারের মতো লেখকেরা তাঁদের রচনায় সেই উদ্বেগকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। সীমিত পরিসরে নির্বাচিত রচনার উল্লেখে বাংলা উপন্যাসের সেই প্রবণতার ধারা তুলে ধরার প্রচেষ্টাতেই এই প্রবন্ধের সার্থকতা।।

তথ্যসূত্র

১. তপোধীর ভট্টাচার্য, আধুনিকতা ঃ পর্ব থেকে পর্বান্তর, পুস্তক বিপনী, ফেব্রুয়ারি, ২০০৪, পৃষ্ঠা ২৫৩

২. *Ecocriticism-Wikipedia, https:en.m.wikipedia.org*, viewed on 12.01.2023, at 9:19 p.m.

৩. www.science.smith.eduviewed on 25.01.23 at 9:20 p.m.

৪. দেবলীনা মুখোপাধ্যায়, পরিবেশচিন্তায় নতুন নিরিখ, পরিবেশ ভাবনা ও প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ, গাঙচিল, কলকাতা, নভেম্বর, ২০১২, পৃষ্ঠা ১৩।

৫. রাজশেখর বসু, পরশুরামের গল্পসমগ্র, এম সি সরকার, আগস্ট, ২০০৩, পৃষ্ঠা ২৭৭-২৭৮।

৬. দেবেশ রায়, উপন্যাসের নূতন ধরনের খোঁজে, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৬, পৃ-৮৭।

৭. পবিত্র সরকার, উপন্যাসতত্ত্ব ঃ বাকতিন প্রপ ইত্যাদি, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, দ্বাদশ ত্রয়োদশ যুগ্ম সংখ্যা, ২০০৪, সম্পাদক জ্যোতির্ময় ঘোষ, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা ৫।

৮. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর, দেজ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৬৬।

৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৯২।

১০. অমর মিত্র, বিভূতিবাবুর দেশ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্ধানে, রুশতী সেন সম্পাদিত, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৪৮।

১১. কিন্নর রায়, প্রকৃতিপাঠ, সমকাল প্রকাশনী, এপ্রিল, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ৫৯।

১২. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৭।

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৭।

১৪. শুভংকর গুহ, নিসর্গ ও পরিবেশ চেতনা ঃ সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যে এক অমোঘ উচ্চারণ, নীললোহিত সাধন চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, দশম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০০২, পৃষ্ঠা ১৪৭

তথ্যঋণ ঃ

১. দেবেশ রায়, উপন্যাস নিয়ে, দেজ, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

২. Prathama Banerjee, Policies of Time : Primitives and History writing in a colonial Society, Oxford University Press, New Delhi, 2006.

৩. কবিতা নন্দী চক্রবর্তী, বাংলা সাহিত্যে পরিবেশচেতনা ঃ রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ জীবনানন্দ, আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৭।

৪. www.tirj.org.in viewed on 25.01.23 at 9:30 p.m.